International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-II, September 2014, Page No. 7-11
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

অপরিচিতের কলমে পরিচিত কথা : পুরবালা রায়, সরোজবাসিনী গুপ্ত ও সরোজকুমারী দেবী

দীপন দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Short Stories, right from their inception, have proved to be important vehicle for expression of human feelings, emotions, doubts and desires. In the 20th century, short stories in Bengali literature emerged as a significant tool for dissemination of progressive thoughts. Women short story writers like Purabala Roy, Sorojbasini Gupta and Sorojkumari Devi have also contributed to this progressive march with their writings. However, compared to their male counterparts, these women writers have attained less attention and critical appreciation from both critics and readers. Consequently, despite having immense potential as writers, their works have remained neglected and hence 'unknown'. In this paper an attempt has been made to highlight the progressive attitudes of Purabala Roy, Sorojbasini Gupta and Sorojkumari Devi towards as writers of pre-partition India, bearing in mind the issues of poverty, religion, culture and communal harmony.

Key Words: Pre-partition India, Bengali Literature, Short Story, Women Writers, Progressive thoughts

।।ক।।

ছোটগল্প সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পাঠক মনে অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি করে চলেছে। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সম্যক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকে বাংলা ছোটগল্প তার ধারাবাহিক প্রবণতাকে ছাপিয়ে গেছে। প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যন্ত্রণা ও টানা পোড়েনে মানবমন ও মনস্তত্ত্বের দোলাচলতার বিভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে বিভিন্ন ছোটগল্পকারকে কেন্দ্র করে। বাস্তবের মাটি ছেড়ে পরাহত, রণক্লান্ত সৈনিকের অবসন্নতা, অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা বাংলা ছোটগল্পকে দিয়েছে পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গরূপ। বিশেষত বৃটিশ শাসক শক্তির শক্তিমত্ততার পরিচয় প্রদর্শনে ও দুঃশাসনিক দোলাচলতায় মানুষের যন্ত্রণা-হতাশা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ছোটগল্প পাঠে আমাদের মন তেমনই ইতিহাসের বিস্মৃত গন্ধ নিতে উৎসুক হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র অতীত নয় এরই সঙ্গে সমকালের সমাজ ভাবনাও বাংলা ছোটগল্পে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের জগতে এমনই কিছু লেখিকা আমাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন, যাঁদের কথা তুলনামূলকভাবে পাঠক সমাজে তেমন বেশি পরিচিত নয় (পুরবালা রায়, সরোজবাসনী গুপ্ত, সরোজকুমারী দেবী)। অথচ তাঁরা অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম সমাজ সমস্যার কথা প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া সেই বিস্মৃত কাহিনিই তাঁদের গল্পে হীরকদ্যুতির উজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে। বিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও অন্ধকারময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের খন্ড চিত্রকেই তাঁদের গল্পে দেখি। আসলে ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সামাজিক বাধা নিষেধের কাছে মুসলিম সমাজ-জীবন আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছিল। সুতরাং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহেই তাঁদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বাস্তবিক উক্ত আলোচ্য গল্পকাররা এই দিকগুলিই প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে আলোকপাত করেছেন।

এই ক্ষেত্রে একসূত্রে তিনটি গল্পের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যই হল গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণধর্মী মতামতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা। প্রথম গল্প 'জমীর মালিক' দ্বিতীয় গল্প 'প্রতীক্ষা' আর তৃতীয় গল্প সরোজকুমারী দেবীর 'দেওয়ানার কবর'। গল্পগুলিতে সামাজিক আচার, প্রথা-বিশ্বাস এবং ধর্মীয় সংস্কারের রূপ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের-সম্পর্কের সূত্রপাত দেখা গেছে। তবে মুসলমান সমাজের শিক্ষা, নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিবাদের ভাষা যা উনিশ শতকের পরবর্তী সামাজিক অবস্থানকেও সূচিত করেছে। গল্পগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে ভিন্ন সম্প্রদায় ও সম সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের প্রবৃত্তি জাত সম্পর্ক-দ্বন্দ্ব, বিবর্তনশীল মনন, প্রণয়-অভীপ্সা, উপেক্ষা-প্রতীক্ষা।

।।খ।।

মহেশ্বর গ্রামের ক্ষুদ্র দীনদরিদ্র ভিক্ষু এমাম মন্ডল ও তার স্ত্রী জেলেখাকে নিয়ে 'জমীর মালিক' গল্পটি রচিত। গল্পের মূল সমস্যা এমামের অর্থনৈতিক বিপর্যয়তা, জমিদারের শোষণ এবং এমামের আত্মহত্যার ঘটনা। তুলনামূলকভাবে শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পেও হিন্দু জমিদারের শোষণ ও মুসলমান প্রজাকে এমনি ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে দেখেছি। এক্ষেত্রে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই-এ বেঁচে থাকার রসদ খুঁজেছে এমাম। সামান্য কিছু খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরী করে দু-পয়সা রোজগারের আশায় বুক বেধেছে। কিন্তু জমিদার তার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষে খাজনা স্বরূপ গুড় নিয়ে চলে গেলে এমাম দু-চোখে অন্ধকার দেখে। অর্থের অভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা সে করাতে পারেনি। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায় এমাম নিজেকেই দায়ী করেছে এবং নিজে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

'প্রতীক্ষা' গল্পে ফুলজান এবং রহিমকে নিয়ে গল্পকার বিচ্ছেদের বেদনাবহ স্মৃতি চিত্রিত করেছেন। পিতা-মাতার একমাত্র আদরের কন্যা ফুলজান আর যশোরের বৃদ্ধ মায়ের একমাত্র সম্বল রহিমকে নিয়েই গল্পটি রচিত হয়েছে। কর্মসূত্রে রহিম পাটের নৌকায় কাজ নিয়ে দূর দেশে চলে আসে। কলেরায় আক্রান্ত হলে, তার সঙ্গীরা অসুস্থ অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। তখন ফুলজানের পিতা-মাতার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করে এবং সেই পরিবারেই থেকে যায়। এখানেই মহাজনের আড়তে সে দশটাকার মাইনেতে চাকরী নেয়। কিন্তু উপবাসী মায়ের কথা ভেবে রহিম ফিরে যেতে চাইলেও ফুলজানের পিতামাতার কাছে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের কথার খেলাপ করতে পারেনি। ফুলজানের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়েছে এবং দীর্ঘ চার বছর সেই পরিবারেই থেকে গেছে। তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মায়ের স্মৃতি বেদনা ক্রমশই তাকে ভারাক্রান্ত করেছে। অবশেষে ফারখৎ পত্রে সই করে ফুলজানকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুদূর যশোরেই চলে গেছে। সেই থেকে প্রতি বছর রহিমের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ফুলজান।

'দেওয়ানার কবর' গল্পে সরোজকুমারী দেবী মুসলমান যুবক হিন্দু বিবাহিতা নারীর প্রতি ভালোবাসার কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। মুসলমান যুবক আমীর, যে প্রকৃতির বুকে উদ্দাম চঞ্চলতাকে নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে ফিরেছে। প্রয়াগের অলিতে মন ভোলানো সেই সুরের সঙ্গে সকলেই পরিচিত ছিল। ধনী লতিফ খাঁর ছেলে আমীর হিন্দু কন্যা ললিতার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তবে সামাজিক সংস্কারের কাছে পরাহত হয়ে আমীর দূর থেকে হৃদয়ের প্রতিমাকে একটিবার দেখেই রূপ তৃষ্ণার মধ্যে দিয়ে আপন হৃদয়কে শান্ত করেছে। ললিতা শ্বশুর গৃহে চলে যাওয়ার পর আমীর আর তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু তাকে একটি বার দেখার জন্য অপেক্ষা করেছে, হৃদয়ের আরাধ্য প্রতিমাকে দেখার আকুলতায় শেষে প্রাণ ত্যাগ করলে সেই গাছের তলাতেই তার সমাধি দেওয়া হয়। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার বন্ধু জামীর নিয়মিত ফুল ও আলো ছড়িয়ে দেয় – এভাবেই প্রয়াগের গল্প কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে।

।।গ।।

'জমীর মালিক' ও 'প্রতিক্ষা' দুটি গল্পেই উল্লিখিত হয়েছে মুসলিম সমাজের নর-নারীর হৃদয় বৃত্তির দ্বন্দ্ব জটিল সংকটময় রূপ। 'জমীর মালিক' গল্পে স্বপ্ন-ব্যর্থতা এবং জমিদারের অত্যাচারের ফলস্বরূপ একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে ছোট্ট গল্পটিতে স্বল্প সময়ে দু-দুটি মৃত্যু ঘটনা আমাদেরকে হতবাক করেছে। জমীর মালিক গল্পের এমামের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা-আত্মযন্ত্রণায় অনুশোচনা এবং আত্মহনন, সর্বোপরি বাসভূমি থেকে উৎখাত সর্বহারা দুর্বল এক চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু 'প্রতীক্ষা' গল্পে রহিম তার বৃদ্ধ মাকে দেখতে গেছে দীর্ঘসময়ের পর। ফুলজানকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, আবার ফুলজানও দীর্ঘ সময় রহিমের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করেছে। তাই দুই চরিত্রই আত্মমনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু সবশেষে ফুলজানের প্রতিশ্রুতিলব্ধ অপেক্ষাই গল্পটিকে চিরন্তন কালের হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। চরিত্রগুলির আত্মিক বেদনা, মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব জটিলতায় গল্প দুটি আমাদেরকে প্রশ্নের মুখে দাড় করিয়ে দিয়েছে। নারী পুরুষের হৃদয় বিদারক বিচ্ছেদের কাহিনি শেষপর্যন্ত গল্পের ক্লাইমেক্সকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যভাবে 'জমীর মালিক' গল্পটির সঙ্গে 'দেওয়ানার কবর' গল্পটির বিচার-বিশ্লেষণেও একটি ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা চরিত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে। দুটি গল্পেই প্রবাহমানতা দেখা গেছে। তবে এমাম মন্ডল ও জেলেখার প্রেম একই সমাজের, অর্থনৈতিক বিপর্যয়তাই এখানে চরিত্রগুলিকে স্থায়িত্ব এনে দেয় নি। কিন্তু 'দেওয়ানার কবর' গল্পে মুসলমান যুবকের হিন্দু বিবাহিতা কন্যার প্রেম-ধর্মগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম মিলন ঐক্যে সমাজই হয়েছে প্রধান অন্তরায়। অর্থনৈতিক সংকট এখানে নেই বললেই চলে।

আবার 'প্রতীক্ষা' ও 'দেওয়ানার কবর' গল্প দুটির ভাবঐক্য লক্ষিত হয়েছে। মুসলমান যুবকের অপেক্ষা করতে করতে প্রণত্যাগ, আর ফুলজানের (প্রতীক্ষা) দীর্ঘ ষোল বছর ধরে পথের দিকে চেয়ে থাকা এ যেন চিরকালীন বিরহের একসূত্রের দ্যোতনা বয়ে আনে। গল্প দুটি একে অপরকে পরপূরক যেন একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ। নামান্তর থাকলেও বিষয় ভাবনায় তাই চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। একরৈখিক এই দুটি গল্পে রহিম, ফুলজান, আমীর এবং ললিতা (অংশ বিশেষ) চরিত্রগুলি কম বেশি কিছু না কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়েছিল।

তাই তিনটি গল্প মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ গল্প বলয়ের সৃষ্টি করেছে। তিনটি গল্পের কাহিনি, চরিত্র সমাবেশে লেখিকারা দেখিয়েছে মানব মনের আন্তরিক চাওয়া-পাওয়া ও দ্বান্দ্বিকতার ছবি। এই ছবিই হয়েছে যুগের কথা, মুসলিম সমাজের কথা, নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে সংগ্রামী মানুষের কথা, আশা হতের কথা-ছবি যা মানবতাকেই চিহ্নিত করেছে।

।।ঘ।।

মুসলিম সমাজ ও চরিত্রের বিস্মৃত পরিচয়ে তিনটি গল্পেই তৎসমসাময়িক যুগ-পরিস্থিতি, ধর্মীয় সংস্কার, প্রথা-বিশ্বাসের খন্ড খন্ড কথা আমরা পেয়েছি। এবিষয়ে লক্ষ করা গেছে ---

ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল এবং কৃষক কিভাবে শ্রমিকে, ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে, জমির অধিকার থেকে চ্যুত হয়েছে – তারই কাহিনি। বিশেষত ব্রিটিশদের অত্যাধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় এবং বাণিজ্যিক আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি

যোগ্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে কৃষককে আগ্রহি করা। তবে ব্রিটিশ মনোভাবের ফলস্বরূপ বাংলায় জমিদারের খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। স্বভাবতই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী না হয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও সুদখোর মহাজনি ব্যবসায়ে আস্থা দেখিয়েছে।

খ। মুসলিম সমাজের আর্থিক দৈন্যতার দিক। ঔপিনিবেশিক অর্থনীতির দৈন্যতা এবং কৃষক-শ্রমিক তথা গ্রামীণ সর্বহারার সংখ্যাটা বেড়ে যেতে থাকে।

গ। রক্ষণশীল ও ধর্মীয় বিধি-বিধান।

জমীর মালিক গল্পে ভিক্ষু এমাম মন্ডল সে কিন্তু জমির অধিকারী হয়নি। জমিদারই জমির মালিক থেকেছে এবং খাজনার বিনিময়ে এমামকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। অবশ্য বাংলার বুকে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্তের প্রভাব, প্রজার কাছ থেকে ইচ্ছামত খাজনা আদায় করা এবং তাদের উপর বলপূর্বক অত্যাচার একটা সময়কাল পর্যন্ত চলেছিল। জমির প্রকৃত মালিকরা তাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়তার সামাল দিতে জমিদারের দারস্থ হয়েছে। ১৭৯৩ থেকে ১৮৮৫ সময় পর্বে যদিও প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থার ব্যপক রদবদল ঘটেছিল। কিন্তু দরিদ্র কৃষক প্রজার অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। এমাম মন্ডল সেও বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল, আর্থিক দুর্বলতা তথা একাকীত্বের যন্ত্রণায়।

'প্রতীক্ষা' গল্পেই আবার সামাজিক সমস্যার রূপ চিত্রিত হয়েছে। নির্জন পল্লী বাংলার গরীব নিরীহ চাষাভূষা মানুষজনই এই গল্পে এসেছে। পল্লীগ্রামের একটা চিত্র সচরাচর আমরা দেখতে পাই, গ্রাম্য মানুষকে ঠকিয়ে আর পাঁচজনের অর্থউপার্জন, বিপরীতে একটি পরিবারের ভূমিহীন, বৃত্তিহীন, অবস্থায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা দ্বন্দ্ব-কলহ, ভ্রান্তি-মোহ, জটিলতার ফলে দেখা গেল সামাজিক অবনতি। গল্পকাররা গল্প লিখতে গিয়ে দুঃখ দারিদ্রতা পূর্ণ মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার দিকগুলি এভাবেই তাঁদের গল্পে নিয়ে এসেছেন। আবার ধর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক শ্রেণি বিভাজন, বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনা প্রবাহের কথাও বলেছেন। তবে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা উনিশ শতক থেকেই প্রবল হয়েছিল। এই কারণে মুসলমান যুবকের হিন্দু নারীর প্রতি প্রণয় প্রীতির মাধ্যমে লেখকরা চেষ্টা চালিয়েছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে। 'ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা', এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী হয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণ লেখকেরা। কারণ তাঁরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ছোটগল্প লিখেছেন। তাই তাঁদের রচনায় এমন এক আর্থসামাজিক হিন্দু-মুসলিম পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে থেকে সমাজে নৈতিক শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজের অগ্রণি হোতা ছিলেন ত্রয়ী লেখিকা। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটাতে চেয়ে গল্পকাররা গল্প রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী-ই সর্বপ্রথম 'প্রেমদর্পন' (১৮৯৯) উপন্যাসটি লিখে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি আনতে চেয়েছিলেন। তিনি মুসলমান যুবকের সঙ্গে হিন্দু নারীর প্রেম ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই দিকটি আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সমস্যা আজও তেমন ভাবেই রয়ে গেছে।

।।ঙ।।

ছোটগল্পের চরিত্ররা স্বল্প পরিসরেই জীবন্ত হয়েছে। লেখিকারা দেখিয়েছেন নারীমন-মনস্তত্তের আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। নারীদের জীবনাচারকে অন্তঃপুরের মধ্যে থেকে নিয়ে এসেছেন বাস্তবের মাটিতে। তারা স্নেহ প্রেম, মায়া-মমতার অপরূপ বন্ধনে পারর্পাশ্বিক অবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তুলল। জীবনের পথে ভাঙা, বাকা চোরা অন্ধকারময় পথকে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এমনই কিছু নারী চরিত্র গল্পগুলিতে এসেছে - জেলেখা (জমীর মালিক), ফুলজান (প্রতীক্ষা), ললিতা (দেওয়ানার কবর)। জেলেখা মহেশ্বর গ্রামে ভিক্ষু এমামের একমাত্র সহযোগী ও সহকর্মী। অর্থকষ্ট থাকলেও সর্বদাই এমামের পাশে থেকেছে। বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী নারীরূপে সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে এমামকে রক্ষা করেছে।

'প্রতীক্ষা' গল্পে ফুলজান বুক বেঁধেছে প্রতিশ্রুতির কাছে। তার মনে সন্দেহ নেই, আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর বিশ্বাস। নিষ্ঠাবান মুসলমান যেমন দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন তেমনি বিশ্বাস ফুলজানের। জীবনের রহিমের (স্বামীর) পছন্দকেই ফুলজান শ্রদ্ধা করেছে। লেখা পড়া শিখেছে এবং অভিজ্ঞতার দুর্বিষহ জীবনকে ছেড়ে কর্মব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেছে। একারণেই রহিমের যন্ত্রণায় সেও কান্না করেছে। এক সময় রহিম তার মাকে দেখতে যেতে চাইলে ফুলজানই বলেছে ---

"অত অস্থির হয়োনা, আমার কথা শোন ফারখৎ পত্রে সই করে দিয়ে তুমি চলে যাও।" (পৃঃ ১৬৭)

এমন সাহস-ভরসা যুগিয়েছে ফুলজান। মাতৃহারা ফুলজান জানে 'মায়ের চেয়ে দুনিয়ায় কেউ বড় নয়।' তাই রহিমকে যেতে দিয়েছে। তবে রহিমের প্রতি তার ভালবাসা এতটুকুও কমে যায়নি। তাদের একে অপরের প্রতি আত্মীক চাওয়া ও বিশ্বাস থেকেই জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ককে প্রতিকায়িত করেছে। শুধু এখানেই নয় ফুলজান পিতার বিরুদ্ধে, সামাজিক প্রথা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদের সরব হয়েছে। রহিমের চলে যাওয়ার কথা উঠতেই ফুলজানের পিতা তালাকের কথা বললে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। পিতাকে ভয় দেখিয়েছে নিজে 'জলে ডুবে' মরবে বলে। তবে রহিমের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকাটা ফুলজানের কাছে দুর্ব্বহ হয়েছে। নিজেকে এক সময় মনে করেছে---

"দুনিয়ায় সে আজ বড় একা, তার যেন সকল কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে। এখন কোন মতে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা।" (পৃঃ ১৬৮)

একদিকে কর্তব্য কর্ম অপরদিকে প্রিয়জনকে দূরে পাঠিয়ে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, আশায় আশ্বাসে প্রতীক্ষা করে গেছে। নানান কাজে সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রেখে স্বাধ্বী ফুলজান চেষ্টা করে গেছে দুঃখ যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে।

'দেওয়ানার কবর' গল্পটির নারী চরিত্র তুলনামূলক ভাবে হিন্দু পরিবারের। কিন্তু উল্লিখিত দুটি গল্পের নারী চরিত্রের মর্মের কথায় গল্প কাহিনি একই সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। শেঠজীর মেয়ে ললিতা পাগল আমীরের গান শুনলেও এক সময় দোতলায়

জানালার ধারে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল। আমীরের দৃষ্টির সামনে থেকে চলে গেলেও গানের অমোঘ আকর্ষণে সে আবার নিজে থেকেই দাঁড়িয়েছে। অপরিচিতের কাছে লজ্জা-কুণ্ঠা সবই উবে গেছে। পাগলের গানে সে খুঁজে পেয়েছে যন্ত্রণাকাতর হৃদয় বিদারক সুর। ললিতা তাই দ্বিরাগমনের দিনে একটিবার চোখের কোণে জল জমেছে। লেখিকা এভাবেই নারী মনের অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাবটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু সচেতন ভাবেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথাটি বর্ণনা করেছেন।

শুধুমাত্র নারী চরিত্রগুলিই নয় পাশা পাশি পুরুষ চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল হয়েছে - এমাম মন্ডল, রহিম এবং আমীর। এমাম সামান্য ভিক্ষু। কষ্টের জীবনে একমাত্র ভরসা জেলেখা। গ্রামের লোকেরা পরিহাস করে বলে - 'এমামটা লক্ষ্মী ছাড়া, চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই আছে কেবল এক সুন্দরী স্ত্রী।' দুঃখ যন্ত্রণাকে তাই কোনকালেই পাত্তা দেয়নি। জেলেখার অসুস্থতায় সে বিচলিত হয়েছে। উপার্জনের জন্য চিন্তিত সকাল বেলাতেই উপার্জনের নেশায় ছুটেছে। ভেবেছে গুড় বিক্রির টাকাতে সমস্যা মিটবে। কিন্তু জমিদারের আগমনে ও গুড় চাওয়াতে তার সব আশাতেই জল ঢেলে দিয়েছে। নির্বাক, আনুগত্যে ও কৃতজ্ঞতাবোধে এমাম জমিদারের কাছে কাতরে প্রার্থনা করেছে দুটি টাকার জন্য। প্রতিদানে শুনেছে উপদেশ। জেলেখার মৃতদেহ দেখে এমাম নির্ভিক চিত্তেই জমিদারের কাছে টাকা চাইতে গেছে। পার্থিব সুখ ছেড়ে দারিদ্রতার চরমতম অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। দারিদ্রতার জীবনে যাদের চোখে উপহাসের ও হাসি-তামাশার বিষয় হয়েছে সেই জমিদার কন্যার বিবাহের বেশে এমাম আবিষ্কার করেছে জেলেখাকে। দেখতে পেয়েছে জেলেখার অস্থি-মজ্জা-রক্ত ক্লান্তিকেই। শুভ্রতা বা আড়ম্বরতার মধ্যেও পেয়েছে নিজের অস্থিরতা ও দারিদ্রতাকে। আপন হৃদয়ের সম্পদকে হারিয়ে এমাম তাই আত্মহননের পথকেই শ্রেয় বলে মনে করেছে।

'প্রতীক্ষা' গল্পের রহিম চরিত্রটিও বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। তবে চরিত্রটি দুইভাবে অস্থির হয়েছে ---

ক। "ফুলজান আমি বড় দুর্ভাগা, তাই তোমার মত স্ত্রী পেয়েও একদিনের জন্য সুখী হতে পারলাম না। তোমাকেও কেবল দুঃখই দিলেম।"

খ। "মা হয়তো না খেতে পেয়ে মরেছে, এমন বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।"

দুই পাড়ের স্মৃতি যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে রহিম। দার্শনিক উপলব্ধি তথা মানবিকতার দিক থেকেও চরিত্রটি একইভাবে উজ্জ্বল হয়েছে।

'দেওয়ানার কবর' গল্পে আমীর যমুনার তীরে মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছে। কুঠিয়াল মাধো প্রসাদের মেয়েকে দেখে আমীরের ঘোর পরিবর্তন দেখা গেছে। মনের মানুষের জন্য, হৃদয়ের আকুলতা নিয়ে আমীর শুধু চেয়েছে একটিবার তাকে দেখতে। আমীরের এই চাওয়াই তাকে নতুনভাবে চিনিয়েছে ---

"ওগো আমার এই টুকুই ভালো। তোমাকে আমি প্রাণ ভরে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমার দুঃখে কাতর হয়েছ, এই-ই আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর কিছু চাইনা, আমি এমনি দূর থেকে তোমায় পূজা করব, তুমি এ দীনের পূজা এইভাবেই গ্রহণ কোরো ....." (পৃঃ ৪৭)

।।চ।।

ট্রাজিক পরিণতির দিক থেকেও ত্রয়ী গল্পই মৃত্যু-বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার বেদনায় চিরকালের গল্প হয়ে উঠেছে। তবে জমীর মালিক গল্পে জেলেখা ও এমামের মৃত্যু আমাদেরকে বিচলিত করেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ও অনুভবের কথায় যন্ত্রণাটা আরো চাগিয়ে দিয়েছে মনক,এ ---

"কি এত অনন্ত স্মৃতি দীপ্তিতে, সে ক্ষুদ্র দাওয়ার উপরে এমামের প্রেম-তৃষ্ণ জীবানুকূল বিষ বিজীর্ণ দেহখানি মৃত্যু সমুদ্রে ভাসমান হইল; আখি তারা দুটি চিরদিনের মত বুঝিয়া গেল"। (পৃঃ ১৪৮)

এমামের হতাশ জীবনের কথা বলতে গিয়ে স্কন্দভূমি, খেজুর গাছ যেন প্রতীকি ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনের সম্পদ তথা প্রকৃতির নির্যাস দুই-ই ফুরিয়ে এলে মৃত্যুই হয়েছে একমাত্র উপায় স্বরূপ।

দ্বিতীয় গল্পটিতেও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ও আত্মবিবেকি মানবিক গুণ প্রকাশিত। প্রতীক্ষায় যারা দীর্ঘ সময় রত থেকেছে তাদেরও পরীক্ষা, এক্ষেত্রে রহিম-ফুলজানের আত্মীক টানাপোড়েনের চিত্রই হয়েছে সফল। রহিমের জন্য একই ভাবে ষোল বছর প্রতীক্ষা তথা দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন। ফুলজানের ট্রাজিক বেদনাকেই প্রকাশ করেছে। এমনই দুটি দৃষ্টান্ত ---

ক। "আল্লার হুকুমে তোমার আমার যে সম্বন্ধ তুচ্ছ তালাক সাধ্য কি সে সম্বন্ধ মুছে ফেলে। এ বন্ধন জন্মান্তরের কার সাধ্য ছিঁড়ে ফেলবে?" (পৃঃ ১৬৭)

খ। "মরণ ভিন্ন আর কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আল্লা জানে, এখানে আমার প্রাণ ফেলে রেখে গেলেম। ফুলজান, তোমায় একবার না দেখে বেহেস্তে যেয়েও আমার সুখ হবে না।" (পৃঃ ১৬৮)

ট্রাজিক পরিণতির চূড়ান্ততম যন্ত্রণাকাতর ছবি উঠে এসেছে 'দেওয়ানার কবর' গল্পেও। বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের ধারাপাতে হৃদয়ের নিকশিত প্রেম রজকিনী মতই চন্দ্রালোকিত থেকেছে। একটিবার মাত্র হৃদয়ের আরাধ্য দেবীকে দেখার জন্য সমস্ত দিন উন্মুখ হয়ে থাকা-অপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আকাঙ্খার দেবী প্রতিমাকে না দেখতে পাওয়া, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় গান গাওয়া, গাছ তলাতেই প্রাণ দেওয়া এই যন্ত্রণা কাতরতাই পাঠক মনকে সিক্ত করেছে।

"কোথায়? আমার জীবনের আরাধনার ধন! আজ তুমি কোথায়? আজ দুদিন তোমার দেখা না পেয়ে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। আমি ত কিছুই চাই না, কেবল দিনান্তে দূর থেকে তোমায় দেখেই আমি পরম আনন্দে ছিলাম, আমায় সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করলে?" (পৃঃ ৪৮)

মানবিক প্রেমের প্রকাশে গল্প তিনটি তাই জীবনের চেনাপথে সবশেষে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। গ্রাম্য সহজ সরল মানুষগুলি অভাবের তাড়নায় সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎই অপরিচিত হয়ে গেছে। প্রতিহত করতে চেয়েছে সামাজিক বাধা বিপত্তি, দুঃখ-যন্ত্রণাকে। এমনই স্মৃতি নিয়ে গল্পকাররা কলম ধরেছেন। গল্পের ভাবসত্যতা, ও আঙ্গিকগত কুশলতায় পাঠক মনকে আপ্লুত করেছে। আবার অন্যভাবে দেখলেও মানবিকতাকে জয়ী করতে পেরেছে মানব বন্দনে। দুঃখ-দারিদ্রতাকে নিয়ে জীবনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন, সামাজিক বাধা-বিঘ্নকে পাশে রেখেও বেঁচে থাকার লড়াই করে গেছে কিন্তু না পাওয়ার যন্ত্রণা ও অতৃপ্তিতেই আশাহত হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে তাই গল্পগুলি ট্রাজিক আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে।

মুসলিম সমাজ-জীবনের এমন রূপ চিত্রণ আমাদের কাছে পরিচিত নয়। লেখিকারা তাঁদের গতানুগতিক পথরেখা থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে যেভাবে মুসলিম সমাজের রূপচিত্রণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। সামাজিক বাধাবিঘ্ন ও প্রথাবিশ্বাসের এই অপরিচিত কথাই আমাদেরকে মুসলিম সমাজ দর্শনে সহায়তা করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্ মুহূর্ত থেকে আজও এই সভ্যতার বুকে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা তেমন ভাবেই রয়ে গেছে। সেই সমস্যা ও সমাজ বাস্তবতার চিত্রণ তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা নতুন করে বুঝে নিতে পারি এই সকল গল্পের মাধ্যমে। তাই অপরিচিত লেখিকাদের কলমে এই কথাগুলো মুসলিম সমাজের পরিচয় প্রদানের শেকড় সন্ধান দিয়েছে - এভাবেই গল্পগুলি সময়ের বিচারে স্থান করে নিয়েছে পাঠকের মনে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চক্রবর্তী, শৈলেন, প্রবাসীর গল্প সম্ভার, প্রথম প্রকাশ পত্রভারতী, ২০০০।
২। গুপ্ত, শ্যামলী, সম্পাদিত, শতগল্প শত লেখিকা (১-ম খন্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৬।
৩। আহমদ, ওয়াকিল, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৪। রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০১২।

***